**উপন্যাস**

**মস্কোর বরফবিথী ও একজন সুতপা**

**পর্ব-৩**

পরীক্ষার ছাড়পত্রটা পেয়েই অপূর্ব হর হর করে বেড়িয়ে আসলো। মনটা খুশীতে ভরা। মন বলছে একটা কফি চাই, সাথে সিগারেটে সুখটান। এই দুইটা খুব ভালোই যায়। আর যখন মনের ভাবনায় সুখ ধরা দেয় তা হলে তো কথাই নেই। এই ডিপার্টমেন্টের স্তালোভায়া (রেস্টুরেন্ট) আর কফি সপটা গ্রাউন্ড ফ্লোরে। ঐদিকেই রওনা দিল অপূর্ব।

কাক বাসে দেলা অপুর্ব (অপুর্ব, তোমার খবর কি)? -পিছন থেকে যেন কে ডাকলো।

কন্ঠটা অবশ্যই চেনা চেনা। নিশ্চয়ই ভাইস ডীন আন্দ্রেইভীচ।

পিছনে ফিরে তাকালো। যা ভাবা তাই ঠিক। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে অপুর্বর দিকে। কিছু একটা বলবে তীর্যক সুরে যা তার সব সময়ের অভ্যাস।

অপূর্ব কিছু বলার আগেই আবারো বলে উঠলো:

-পরীক্ষার ছারপত্র মিলেছে?

-হ্যাঁ, মিলেছে আন্দ্রেই আন্দ্রেইভিচ”

-খুব ভালো।

তবে কথাটা এমন ভাবে বললো যেন না পেলেই সে খুশী হতো। সারা ডিপার্টেন্টে এ একটি মানুষ যার মন বলতে কিছুই, নেই। অন্যের দুঃখ দেখে সে দুঃখ পায় কিনা অপূর্বর জানা নেই তবে খুশী যে হয় না তা নিশ্চিত। আর কথা না বাড়িয়ে অপূর্ব কফি সপের দিকে চলে যায়। অনেক লোকই ছিলো কফি সপে। এখন সম্ভবত ব্রেক চলছে। তাই ভীরটা একটু বেশী। ভেতরে ঢুকেই খুব লম্বা লাইন চোখে পড়লো। তবে এখন আর তাড়া নেই। মনটাও ফুর ফুরে।

প্রায় ১০ মিনিট পরে কফিটা হাতে নিয়ে বাইরে চলে এলো স্মোকিং এরিয়াতে।

যখন হোস্টেলের রুমে ফিরে আসে তখন দুটা। দুপুরের খাবারটা মেইন বিল্ডিং এর রেস্টুরেন্ট (স্তালোভায়া) থেকে সেরে আসতে হবে। তবে ক্ষুধা যেহেতু এখনো পুরোপুরি আক্রমন করতে শুরু করেনি তাহলে একটু বিশ্রাম করে গেলেই হবে। অপূর্ব ভাবলো-

আজ অপূর্বর মেজাজটা খুব ভালো। গত সপ্তাহটা খুব ঝক্কি ঝামেলার মধ্যে কাটলো। সব কষ্টের একটা ফল পাওয়া যায় এটা অপূর্ব হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলো। আপাততঃ পরীক্ষার ঝামেলাটা শেষ। একে একে সবগুলিতেই ছাড়পত্র পেল, পরীক্ষাও শেষ হলো ভালো ভাবেই।

এখন অন্তত কয়েকটা দিন পড়াশুনায় ইস্তফা। ক্লাশ শুরু হলে আবার দেবী স্বরস্বতীর প্রার্থনায় নামবে।

অপূর্বর ভাবনারা আবার পেখম মেলে উড়তে লাগলো।

সালটা ১৯৯০। মার্চ মাসের ১৬ তারিখ। ঐ দিনের কথাই মনে পড়ে গেল-আজ রোস্তভ যাবে ভেবেছিলো। কিন্তু বিধি বাম! যাওয়া আর হলো না। নিজের উপর প্রচন্ড রাগ হলো অপূর্বর। নিজকে নিজেই বকাবকি করল অনকক্ষন। তার মনে হলো সে একটা অপদার্থ, জগতে কিছুই করতে পারবে না। ইদানীং বেশ অসহায়ত্বের জ্বালায় ভুগছে। কোন কিছুতেই যেন মন বসাতে পারছে না। সব কিছুতেই একটা অস্থিরতা। খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে সব কিছুতেই একটা উদাসীনতার ভাব। অনিয়মিত খাওয়া দাওয়ার কারনে স্বাস্থ্য বড্ডো ভেঙ্গে পড়ছে। অসহ্য! কি এক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে যে দিন কাটাচ্ছে একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। এক সময় অপূর্ব ভাবতো কিছু একটা করতে হবে, তাই বাঁচার একটা প্রচন্ড আকর্ষন বোধ করতো।

কিন্তু আজ? মাঝে মাঝে মনে হয় বেঁচে কি হবে?

অনেক দিন আগ থেকেই প্ল্যান ছিলো রুস্তভে যাওয়ার। শহর দেখতে না। শুধু একজনকে দেখতে। যাকে প্রথম দেখেছিল ঢাকা এয়ারপোর্টে। নবাগতা। সোভিয়েত ইউনিয়নে এসেছে গত সেপ্টেম্বরে লেখাপড়া করতে। সেই এয়ারপোর্ট থেকে মস্কোতে একই প্লেনে ছিল। এরোফ্লটই ছিলো তখন সরাসরি মস্কোতে আসার একমাত্র উপায়। প্রথমে মুম্বাই, পরে তাসখন্দ হয়ে সরাসরি মস্কো সেরমিতোভা আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট। সেবার অপূর্ব প্রথম বাংলাদেশে বেড়াতে গিয়ছিল। মস্কোতে আসার দুই বছর পর। প্রিপারেটরি আর প্রথম বর্ষ শেষ করে। প্রিপারেটরিতে এক বছর রুশ ভাষা শিখতে হতো। তবে ছয় মাস পর থেকে রুশ ভাষার সাথে সাথে প্রধান বিষয়গুলোও পড়ানো হতো।

অপূর্ব ভাবতে লাগলো-

প্লেনে আমার পিছনের সিটে বসেছিল সে। ওর সাথে আরো দুজন নবীন ছিলো। সাথে আমাদের প্রিয় নাসরিনও ছিলো। খুব চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে । কিন্তু মনটা খুব ভালো। কোন সমস্যা হলেই আমার রুমে চলে আসতো। সব সমস্যার কথা একটার পর একটা বলে যেতো। না থামালে যেন থামতে চাইতো না। ও পড়ছে মেডিসিনে। ১০ নম্বর হোস্টেলে থাকে। আমার এক বছরের জুনিয়র। দেশের জন্য, পরিবারের জন্য ওর মনটা সব সময় ছটফট করতো। দেশ থেকে আসার পর সে অনেক বার একলা রুমে একা একা কেঁদেছে। আমার কাছে এসেও কাঁদতো। এর মধ্যেই দেখলাম নাসরিন ওদের সাথে গল্পে মজে গেছে। কখনো আবার উচ্চস্বরে হাসছে। ও প্রায় সময়ই খুব হাসিখুশী থাকে এবং সবাইকে খুব মাতিয়ে রাখে।

নাসরিনকে অনবরত হাসতে দেখলে অপূর্বর গ্রিক হাসির দেবতা “জোলোস” এর কথা মনে পরে। কোন এক বইতে পড়েছিল যে জেলোসের হাসিটা ছিলো খুব মাধুর্যময় এবং সংক্রামক যা সবচেয়ে খারাপ ব্যক্তিকেও হাসাতে পারতো। তার হাসি এতটাই সংক্রামক ছিল যে এমনকি দেবতারাও এর অপ্রতিরোধ্য শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া প্রতিরোধ করতে পারে নি। তার প্রফুল্ল স্বভাব তাকে নশ্বর এবং অমর উভয়ের মধ্যে একইভাবে জনপ্রিয় করে তুলেছিল, কারণ অন্যান্য দেবতারও প্রায়শই তার সঙ্গ খুঁজত নিজকে আনন্দ দেওয়ার জন্য, জেলোসের সাথে হাসি ভাগ করে নেওয়ার জন্য। অনেকে জেলোসের হাসিকে বুদবুদ ধলপ্রহরের সমুদ্রের আওয়াজের সাথে তুলনা করেছেন। অন্যরা এটিকে পাথরের সাথে আছড়ে পড়া বজ্রধ্বনি ঢেউয়ের সাথে তুলনা করেছেন বা ভোরবেলায় কোরাসে মত্ত পাখিদের কিচিরমিচির।

নাসরিনের হাসিতেও একটা প্রফুল্লতা বিরাজ করতো। তার উপস্থিত বুদ্ধিও ছিল প্রখর, যা তাকে শত্রুতা এবং কলহের পরিবর্তে হাসিতে ভরা যে কোনও পরিস্থিতি তৈরী করতো। বরং যে কোন দ্বন্দ্ব বা সংঘাত সৃষ্টি হওয়ার আগেই মানুষের মধ্যে আনন্দেও উত্তেজনা ছড়িয়ে দিতো। হাসির কি সম্মোহনী শক্তি!

-নাসরিন, একটু আস্তে হাসো। অনেকে বিরক্ত হবে

-একটু চাপা কন্ঠে অপূর্ব বলল।

সাথে সাথে বজ্রাঘাত

-কেউ বিরক্ত হবেনা অপুর্বদা, আপনি ছাড়া।

আবার উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়লো সবাই।

-তোমার নাম কি? -অপূর্ব ঠিক ওর পিছনে বসা মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল।

-ওর নাম সুতপা-নাসরিন উত্তর দিলো।

-পুরো নাম কি?

-আপনি পুরো নাম জানতে চাচ্ছেন কেন অপূর্বদা? উত্তরের অপেক্ষা না করে আবার বলে উঠলো-

- সুতপা চৌধুরী, আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন? -যেন শাষানীর সুর

তবে মেয়েটি একেবারে চুপচাপ। কিছু বলছেনা। যেন কোন কিছু নিয়ে গভীর ভাবে ভাবছে। চোখ জোড়া প্লেনের সিটের পাশের ছোট কাচের জানালা ভেদ করে দুর আকাশে যেন স্থির হয়ে আছে। সম্ভবত অপূর্বর প্রশ্নগুলি শুনতে পায়নি কিংবা শুনতে পেলেও উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি।

অপূর্ব মনে মনে বির বির রতে লাগলো-

ওকে জিজ্ঞেস করছি অথচ আরেকজন উত্তর দিচ্ছে। ভাবলাম মন খারাপ হয়তো। তাই নিজের ভাবনায় মনোযোগ দিলাম। অনেক হাসি-তামাসা আর সোভিয়েত জীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনাতে শুনাতে এক সময় মস্কো এসে পৌঁছলাম। তখন রাত ৮টা। সামারের শেষ সময়। আগাস্টের শেষ দিন। মস্কোর সামার মাসগুলো খুব চমৎকার। ডিসেম্বরের শেষ দিক থেকে দিন বড়ো হতে থাকে। তখনথেকেই আমার মনটাও ভালো হতে থাকে। অন্ধকারকে কেইবা পছন্দ করে? আগষ্ট মাসে সন্ধ্যা হয় রাত ১০টার পরে। তাই এখনো বিকালের ফর্সা ভাবটা একেবারে তুঙ্গে।

নতুন ছেলে-মেয়েদেরকে নিয়ে যেতে সিনিয়র ভাইদের অনেকেই এসেছেন এয়ারপোর্টে। এইটা মস্কো বা সোভিয়েত জীবনের প্রথা। কোন ক্যাপিটালিষ্ট সমাজে এই সহযোগীতার ব্যাপারটা কখনো কল্পনা কর যায় না। নতুন কেউ পড়াশুনার জন্য আসলে সোভিয়েত ইউনিয়নে অবস্থিত বাংলাদেশী ছাত্র সংঘটন আগ থেকেই জানতে পারে। সংগঠনের পক্ষ থেকে কেউ না কেউ থাকবেই। তবে মস্কোর পেট্রিস লুমুম্বা ইউনিভার্সটিতে একটা বড়ো অংশের বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করতো বিধায় এ ইউনিভার্সিটিতেও একটা প্রভাবশালী বাংলাদেশী ছাত্র সংগঠন ছিলো। যা হোক ইমিগ্রেশন পার হয়ে মাল পত্র নিয়ে আমি অন্যন্য বন্ধুদের সাথে হোষ্টেলে চলে আসলাম।

নতুন শিক্ষার্থীদেরকে আজ ইউনিভার্সিটি হোস্টেলে নিয়ে যাবে। এই হোস্টেলটি মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটির সামনেই অবস্থিত। শুধুমাত্র নতুন সদ্য বিদেশ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে পড়াশুনার জন্য আগত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্যাবহার করা হয়। এখান থেকেই সবাইকে যার যার গন্তব্যে প্রেরন করা হয়।

মস্কো স্টেইট ইউনিভার্সিটিটি একটি মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। আর এই হোস্টেলটি ইউনিভার্সিটির খুব কাছেই। প্রথম যখন অপূর্ব এখানে আসে সেদিন অপূর্বর ক্লাশমেট ইলিয়ানা কতো না গল্প শুনিয়েছিলো এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে নিয়ে। সোভিয়েত বাসীর জন্য এটা ছিলো একটা আইকনিক। এখানে পড়া মানে জীবনে অনেক বড়ো কিছু হওয়া।

মস্কোস্টেট ইউনিভার্সিটি রাশিয়ার প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে মানসম্পর্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে একটি । এখানে আসলে সবচে ভালো লাগে ইউনিভার্সিটির চারিদিকে সাজানো সারি সারি বিস্তৃত প্রসারিত ওক, পাইন, এসপেন এবং আপেল গাছগুলিকে। মনে হবে কোন স্বর্গের সাঁজানো বাগান। উদাসী বাতাসেরা জাপটে বেড়ায় পাতার ভাঁজে ভাঁজে। পাতার বুক চিরে যখন গ্রীস্মের পরন্ত সন্ধ্যায় মৃদু সমীরনের দোল খেয়ে যায় তখন এইখানকার সবুজ বনবিথীর পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে চলায় থাকে প্রাঞ্জলতা। অপূর্ব অনেকবার এর সৌন্দর্যকে দুহাত ভরে নিয়েছে, হয়েছে ঋদ্ধ।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছে মিখাইল গর্বাচেভ (সাবেক রাষ্ট্রপতি), ইয়েভজেনি প্রিমাকভ (প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী), বরিস ইয়েলৎসিন (প্রথম রাষ্ট্রপতি), আলেকজান্ডার পুশকিন (কবি)), ভলাদিমির লেনিন (বিপ্লবী নেতা), এবং অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। অসংখ্য নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের মিলন মেলা ছিলো এই বিশ্ববিদ্যালয়. পদার্থবিদ্যার জন্য ভিতালি গিন্জবার্গ, শান্তির জন্য আন্দ্রেই সাখারভ; সাহিত্যের জন্য আলেকজান্ডার সলঝেনিটসিন এবং আইজ্যাক বাশেভিস সহ আরো অনেকেই।

বিমানে থাকতেই সুতপা এবং বাকী নতুন সবাইকে অপূর্ব বলে এসেছিল দেখা করতে হোস্টেলে আসবে।

তাই যেদিন সুতপা রুস্তভের উদ্দেশ্যে মস্কো ত্যাগ করে সে দিন অপূর্ব ওকে এবং অন্যান্যদেরকেও দেখতে গিয়েছিল। সে তখন ওর লাগেজ পেটরা নিয়ে বাকী বন্ধুদের সাথে ইউনিভার্সিটি হোষ্টেলের সামনের আঙ্গিনায় কোচের জন্য অপেক্ষারত ছিলো। নতুন বন্ধুরা দেশ থেকে এসেছে শুনে অনেক পুরনো বন্ধুরাও ওদের সাথে দেখা করতে এসেছিলো। সবাই যেন গল্পে মশগুল। দেশের কথা শুনছে কেউ, আবার সিনিয়র বন্ধুরা সোভিয়েত সমাজকে নিয়ে বলছে, আবার কেউ কেউ উপদেশের বুলি আউরাচ্ছে। নতুন দেশে কিভাবে চলাফেরা করতে হবে তারই খিস্তী-খেউরি।

ট্যাক্সীওয়ালাকে ভাড়াটা চুকে দিয়ে ট্যাক্সী থেকে বেরুল অপূর্ব। সামনের দিকে চোখ বুলোতেই হঠাৎ করেই যেন ১৫/২০ গজ দুরের ঐ মেয়েটির দুচোখে ওর চোখ আটকিয়ে গেল। ছ্যাৎ করে উঠলো বুকটা। বুকের পাজরগুলি দিয়ে যেন তীব্র জোড়ে জলোচ্ছ্বাস বয়ে যাচ্ছিলো। কী ডাগর ডাগর মায়াবী চোখ। এক দৃষ্টিতেই তাকিয়ে আছে। সেও তাকিয়ে আছে। হয়তো অপূর্বকে চেনার চেষ্টা করছে।

কাছে এগুতেই অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো-

- দুদিন পর আজ আসলেন? একটু পরে আসলেই আর দেখা হতো না। কেমন আছেন আপনি?

লজ্জায় পড়ে গেল অপূর্ব। খুব আরষ্টবোধ করল। প্রসঙ্গ এড়িয়ে কুশল জিজ্ঞেস করল-

-কেমন আছো সুতপা? প্লেন থেকেই এই নামটা জানত অপূর্ব।

-ভালো। আর আপনি?

-খুব ভালো। অপূর্বও উত্তর দিল।

-সকালে ব্রেকফাস্ট করেছ? জিজ্ঞেস করল।

-না, শুধু সকালেই না। গত দুদিন এখানকার কিছুই খেতে পারছি না। সব কিছুতেই কেমন একটা গন্ধ লাগে। খেতে গেলে বমি আসে।

-বলো কি? সর্বনাশ! না খেলে যে তোমার শরীর খারাপ হয়ে পড়বে। এখন আবার যাবে কতোদূর।

-ভাববেন না। বড়ো ভাইয়েরা আমাদের সবার জন্য খাবার নিয়ে এসেছেন। বিস্কিট, পাউরুটি, কলা, জুস সবই আছে। ট্রেনে উঠে খেয়ে নেব।

-ভালো কথা। তোমাদেরকে কোথায় পাঠাচ্ছে? মানে কোন শহরে তোমাদের কনফার্ম হলো।

-আমরা সবাই রুস্তভে যাচ্ছি। ঐখানকার ইউনিভার্সিটিতেই আমরা পড়বো।

-তোমরা সবাই মানে? - জানতে চাইল।

-আমরা পাঁচ জন মেয়ে আর কয়েক জন ছেলে আছে। সবাইকে রুস্তভে পাঠাচ্ছে। বাকীরা অন্য শহরে যাবে

-যাহোক। সাবধানে থেকো।

অন্য ছেলে-মেয়েদের সাথেও কিছুক্ষন কথা বার্তা হলো।

এক সময় অপূর্ব ওর ঠিকানাটা লিখে দিয়ে বিদায় জানাল।

-চিঠি লিখো।

-মাথা নেড়ে সায় দিলো।

ঠিক সেই দিন থেকেই ওর প্রতি কিযে এক প্রচন্ড আকর্ষন বোধ করত। বুঝানোর ভাষা নেই। ঐদিন ওর ডাগর দুটি চোখে কি

দেখেছিল অপূর্ব?

মানুষের চোখ যে এতো মায়াবী আগুন ঝড়া বিদ্যুতের মতো হতে পারে! ভাবতেও অবাক লাগে। কি অপরুপ সুনয়ন। দুটি হৃদয়ের মধ্যে সত্যিকারের সংযোগ এবং বোঝা পড়ার সেতু বন্ধনে কি যত্নশীল, আমাদের ভাষা আর সংস্কৃতির বাধাগুলোকে অতিক্রম করায় কি ভয়ানক পারদর্শী এ চোখের গভীরতা যা আমাদের গভীরতম অনুভূতিগুলোকে থরে থরে সাজিয়ে দেয় ফুলের তোড়ার মতো। চোখ যেন আত্মার দক্ষিনের জানালা। একবার খুলে দিলেই উলঙ্গ বাতাসের উচ্ছ্বাস। মাঝে মাঝে মনে হতো গ্রীকদেবতা আ্যাথেনার চোখ যেন বসিয়ে দেওয়া হয়েছে সুতপার চোখে।

দেবতাদের অনেকেই এই উজ্জ্বল চোখের দেবীকে শুধুমাত্র এক নজর দেখার জন্য তার কাছে ছুটে আসতো। কতো দেবতা তার প্রেমে পড়েছিল সে সম্পর্কে প্রচুর গল্প রয়েছে। এথেনার চোখের সৌন্দর্য প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনী থেকে আধুনিক সাহিত্যে শতাব্দী ধরে মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। ঐচোখে একবার তাকালে যেন আর ফেরানো যায় না। সুতপার চোখ দিয়েও যেন কিলিমান্জারো পর্বতের গা ঘেঁষে সফেদ ঝর্নার বিচ্ছুরন চিটকে পড়ছে চারিদিকে। অপূর্ব!

সুতপার চোখে সাথে সাথে তার চুলের সৌন্দর্য কম যায় কিসে? একেবারে ঘন কালো কেশ যেন পা পর্যন্ত আছড়িয়ে পড়ছে। বাঙালী মেয়েদের তুলনায় সুতপা একটু বেশীই লম্বা। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম বর্না। জিন্সের সাথে বনলতাকেশী ওকে খুব দারুন লাগছিল সেদিন।

তার পর অনেক দিন চলে গেল। নানা ব্যস্থতায় কেটে যায় অপূর্বর দিনগুলি।

গত পরশুদিন সুতপাকে জানিয়েছিল আজ রুস্তভ যাবে। নিশ্চয় সে অপেক্ষায় থাকবে? গত চিঠিতে রুস্তভ গেলে মাছ খাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বড় কষ্ট পাবে মেয়েটা। হয়তো বা না। অপূর্ব যাওয়ার কথা হয়তো ভুলেই গেছে। অপূর্ব ওকে নিয়ে যতো ভাবছে, ওকি অপূর্বকে নিয়ে তাই ভাবছে?

অপূর্বর মনের ভাবনায় কিল বিল করে চিন্তাগুলি।

**(চলবে---)**

**ড. পল্টু দত্ত**

শিক্ষক, গবেষক এবং কলামিষ্ট